মানবিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের আধিপত্য: আশ্রয় সৈয়দ শামসুল হকের *ঈর্ষা*

ফাহমিদা সুলতানা তানজী*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ : ঈর্ষা একটি জটিল ও যৌগিক প্রক্রিয়া। মানব-জীবনের সূচনালগ্ন থেকে ঈর্ষা নামক পাশবিক এই অনুভূতিটির সূত্রপাত হয়েছিল, যার ধারা আজও অব্যাহত আছে। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে এটি সহনীয় মাত্রায় থাকে, পরে তা ক্রমশ পাশবিকতার পর্যায়ে পৌঁছায়। সব্যসাচী নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) তাঁর *ঈর্ষা* (১৯৯০ সালে রচিত) নাটকটির মাধ্যমে মানব-সম্পর্কের মাঝে বিরাজমান এই ধারাটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন। কেন মানুষ এই জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়, এই প্রশ্ন থেকে বক্ষ্যমাণ গবেষণার সূত্রপাত। সমগ্র নাটক জুড়ে দেখা যায়, তিনটি শিল্পীসত্তা স্বীয় স্বার্থকে অগ্রসরমান করার স্বার্থে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে। ফলাফলক্রমে, ঈর্ষা নামক ভয়ানক অনুভূতির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধকারের প্রয়াস থাকবে, কেন প্রৌঢ়, যুবক ও যুবতী চরিত্রত্রয়ের মাঝে ঈর্ষা নামক ভয়ানক অনুভূতির উদ্রেক হয়েছে তা অনুসন্ধান করা। ফলাফলস্বরূপ প্রমাণের প্রয়াস থাকবে যে, মানব-জীবনে ঈর্ষা নামক পাশবিক অনুভূতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও আস্থা ও বিশ্বাস নামক মানবিক অনুভূতির আধিপত্য যে-কোনো জীবনে স্বস্তি এনে দিতে সক্ষম।

চাবি শব্দ (Keywords) : ঈর্ষা, অনুভূতি, ওথেলো কমপ্লেক্স, সত্য মানুষ, প্রেম।

Abstract: Jealousy is a complex and composite process. Since the beginning of human life, this brute emotion called jealousy emerged, which has continued till today. Although it is tolerable in its initial stages, it gradually reaches the level of brutality. Prolific playwright Syed Shamsul Haque (27 December 1935-27 December 2016) through his play *Jealousy* (written in 1990) clearly expresses this tension between human relationships. The question of why people are forced to live through this complex process is the origin of this study. Throughout the play, the three artists are in a conflict to uphold their own interests. As a result, the terrifying feeling called jealousy arises. The present paper will try to find out why the terrifying feeling of jealousy has arisen among the three characters: old man, young man and young woman. Thus, the paper attempts to prove that despite the intrusion of the brute feeling of envy in human life, the dominance of the human feelings such as trust and faith is capable of bringing relief to any life.

---

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
ই-মেইল: fahmida.tanjee@gmail.com

১.১ ভূমিকা : সন্দেহাতীতভাবে ঈর্ষা যে-কোনো মানবদশার জন্য বিপুল ক্ষতির কারণ। প্রতিটি মানুষ তার জীবদ্দশার যে-কোনো পর্যায়ে এই ভয়ানক অনুভূতির সম্মুখীন হয়। এর ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিমানুষের সাথে ব্যক্তি-সম্পর্কের অবনতি ঘটে থাকে। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় সব্যসাচী নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত নাটক *ঈর্ষা*কে কেন্দ্র করে মানবমনের এই জটিল অধ্যায়টির সূচনা কেন জেগে ওঠে, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে। গবেষণার মূল বিষয় ঈর্ষা। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সৈয়দ হকের *ঈর্ষা* টেক্সটটি প্রৌঢ় চরিত্রটির চাওয়া, যুবক চরিত্রটি পেয়ে ছেড়ে যাওয়া কিংবা যুবতী চরিত্রটির সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগার কারণ নাট্যকার অত্যন্ত সুন্দর ও নান্দনিক উপায়ে বিশ্লেষণ করেছেন। সরলভাবে বলতে গেলে *ঈর্ষা* টেক্সটটি ত্রিভুজ প্রেমের ওপর গঠিত। আর প্রেম নামক অনুভূতিতে ঈর্ষা নামক মানবিক অনুভূতির উদ্রেক হয়, যা ক্ষেত্রবিশেষে পাশবিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সমগ্র টেক্সটটি সৈয়দ হক ওথেলো কমপ্লেক্সের অনিয়ন্ত্রিত হিংসা ও ঈর্ষার ওপর নির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যে-কোনো প্রেমের সম্পর্কে ঈর্ষা একটি রোমান্টিক অধ্যায় : “If you have not experienced jealousy, you have not loved.” (Harris & Darby, 2022, p. 547)। কিন্তু এটি তখনই ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে, যখন এতে উভয় কিংবা যে-কোনো একপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আলোচ্য নাটকটিতে নাট্যকার স্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন, ঈর্ষা নামক পাশবিক অনুভূতির বিপরীতে আস্থা ও বিশ্বাস নামক অনুভূতি স্থাপন করতে সক্ষম হলে জীবনে স্থিরতা ও স্বস্তি বিরাজ করে, যা যে-কোনো মানুষেরই কাম্য। নাটকটির শেষাবধি চুলে পাক ধরা তরুণীর উপস্থিতি জীবনের বিলুপ্তি নয়, বরং তার বিপরীতে সৈয়দ হক স্থাপন করেছেন আস্থা। আর আস্থা নামক বিষয়টি যে-কোনো সম্পর্কের জন্য একান্ত কাম্য।

১.২ লিটারেচার রিভিউ : মূলত গবেষণার মাধ্যমে সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়। যেহেতু সৈয়দ হকের *ঈর্ষা* নাটকটি ভিন্ন সংস্কৃতির তত্ত্ব দিয়ে প্রভাবিত, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে অনুসন্ধানের বিষয় থাকবে– ইউরোপীয় সংস্কৃতির ঈর্ষা উপাদানটি এদেশীয় সংস্কৃতি ও মানুষের আচরণের মধ্যে বিরাজমান কি-না। ঈর্ষার প্রভাব এদেশে যেমন বিরাজমান, তেমনি পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষের মনের মাঝে বিরাজমান। ঈর্ষা নামক অনুভূতিটি একদিকে যেমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ তেমন ইতিবাচক উপায়ে দেখতে গেলে এর মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে। এটি তখনই সম্পর্কের ক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ হয়, যখন এটি মানবিক পর্যায় থেকে পাশবিকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে প্রমাণ করা হবে, সৈয়দ হকের তিনটি চরিত্র যারা কিনা প্রাপ্তবয়স্ক এবং এদের মাঝে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে প্রেম নামক আবেগের কারণে, যদিও কেবল প্রেম এত বড় দ্বন্দ্বের সূত্রপাতের একমাত্র কারণ নয়। আর তাই ঈর্ষাতত্ত্ব ও পরিচয়তত্ত্ব এক্ষেত্রে ওথেলো কমপ্লেক্সের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হবে। ওথেলো কমপ্লেক্সটি কিভাবে সৈয়দ হকের চরিত্রগুলোর আবেগকে প্রভাবিত করেছে তা প্রাথমিকভাবে এক্ষেত্রে অনুসন্ধানের বিষয়। কারণ : “Shakespeare state that we should suppress our negative feelings and shape our lives accordingly.” (Kesgin & Hashemipour, 2020, p. 59)। শেক্সপিয়র (১৫৬৪-১৬১৬) তাঁর লেখনীর

দক্ষতায় মানব চরিত্রের একটি দুর্বলদিক তাঁর *ওথেলো* (১৬০৩) নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি ইয়াগো চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানবদশার এমন এক মানসিক অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, যার মাধ্যমে মানবিকতার ক্ষতি ভিন্ন অন্য কিছু হয় না। তিনি ইয়াগোর ক্ষতিকর আবেগকে মানসিক ব্যাধি অবধি নিয়ে গেছেন। তবে *ওথেলো* নাটকটি দ্বারা প্রভাবিত হলেও *ঈর্ষা* নাটকটির পরিণতি সৈয়দ হক স্বীয় প্রতিভার গুণেই অন্বেষণ করেছেন। ঈর্ষা ও ওথেলো কমপ্লেক্স নিয়ে আলাদাভাবে গবেষণা হলেও একসাথে এই দুটো তত্ত্বের প্রয়োগ করে বাংলা ভাষায় গবেষণা হয়নি। উল্লেখ্য গবেষণাটি এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে, কেন মানুষ ঈর্ষান্বিত হয় এর কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্যে সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের প্রয়াস চালানো হবে।

১.৩ গবেষণা কাঠামো : বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে জানা উপাত্তকে ব্যবহার এবং জ্ঞাত জ্ঞানকে প্রয়োগের মাধ্যমে অজানা তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রবন্ধটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস থাকবে। এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নবতর ফলাফলের অন্বেষণ করা হবে। তাছাড়া সাহিত্য-গবেষণায় *ঈর্ষা* নাটক সংক্রান্ত যে শূন্যতা রয়েছে, তা পূরণের প্রয়াস চালানো হবে। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় ঐতিহাসিক সত্যকে উন্মোচনের লক্ষ্যে শামসুল হকের *ঈর্ষা* নাটকটির টেক্সট বিশ্লেষণ করা হবে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। আর এক্ষেত্রে সামগ্রিক সত্যকে উন্মোচনের ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা (Qualitative Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে এবং এর প্রধান কারণ গবেষণার কাজে প্রাপ্ত তথ্য, তত্ত্ব ও উপাত্ত পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। তাছাড়া সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে যেহেতু টেক্সটকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, সেহেতু পরিমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কম।

১.৪ তাত্ত্বিক কাঠামো : প্রতিটি মানুষ তার জীবদ্দশায় ঈর্ষা নামক বিস্ময়কর পরিস্থিতির স্বীকার হয়। শামসুল হকের *ঈর্ষা* নাটকটি পাঠান্তে দেখা যায় চরিত্রগুলো আত্মচেতনা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেরা হয়ে পড়েছে ঈর্ষাক্লিষ্ট। এর থেকে পরিত্রাণের এক ধরনের উপায় হচ্ছে, মানুষ যদি তার সীমা ও ভয় সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন থাকতে পারে। কিন্তু *ঈর্ষা* টেক্সটটি পাঠান্তে অনুভূত হয় তিনটি চরিত্রই যেন সীমা ও ভয় লঙ্ঘনে তৎপর। *ঈর্ষা* টেক্সটটি ব্যবচ্ছেদের পূর্বে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরি বিধায় তা উপস্থাপন করা হলো।

(১) মূল বক্তব্য : নাটকটি আরম্ভ হচ্ছে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের একটি গান মৃদুভাবে বেজে চলেছে। সংলাপের শুরুতেই প্রৌঢ় নামক চরিত্রের রুদ্রভঙ্গিতে যুবতীর সাথে কথোপকথনের সূত্রপাত। প্রৌঢ় বলে :

> না, যাবে না, যেতে পারবে না, যেতে আমি তোমাকে দেবো না।
> এভাবে যেতে তুমি পারবে না। 'আমি বিয়ে করেছি'–
> এ কথা বললেই সব শোনা, সব বলা শেষ হয়ে যায় না। (হক, ২০১৬, পৃ. ১৩)

নাটকে তিনটি চরিত্র প্রৌঢ়, যুবতী ও যুবক তিনজনই শিল্পী। প্রৌঢ় চারুকলার শিক্ষক ছিলেন। আবার বৃদ্ধ স্বয়ং শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ছাত্র ছিলেন। সে দাবি করে জয়নুলের বদলে আজ সে দাঁড়িয়ে আছে, আর সম্মুখে মৃত্যু উপস্থিত জেনেও জয়নুল যে নারীকে আহ্বান করেছিল, যুবতী তার বদলে উপস্থিত। প্রৌঢ় মূলত এ্যাবস্ট্রাক্ট ধারার ছবি আঁকে; তবে গোপনে সে যুবতীর ন্যুড এঁকেছিল, যুবতীও সিটিং দিয়েছিল ভালবাসার টানে। প্রৌঢ় যখন সরাসরি শিক্ষকতার পেশায় ছিল, তখন যুবতীর সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ। প্রৌঢ় সাধারণত ওপরের ক্লাসগুলো নিত, সে যুবতীর কোন ক্লাস নেয়নি। প্রৌঢ়ের ভাস্কর্য বিভাগের যাত্রার পথে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। তাদের প্রাথমিক কথোপকথনে স্যার সম্বোধন প্রৌঢ় মেনে নিতে পারেনি :

> অস্বীকার করবো না আজ, সেদিন প্রথম মনে হয়েছিল বুড়ো হয়ে গেছি,
> রক্তমাংস থেকে আমি নিজের অজান্তে কবে হয়ে গেছি সম্মানিত নাম, (হক, ২০১৬, পৃ. ১৯)

এরপর সযতনে প্রৌঢ় এড়িয়ে গেছে যুবতীকে। কিন্তু যুবতী নিজেই কোন একদিন প্রৌঢ়ের বাসায় যায় কাজ দেখাতে। তার পরনে ছিল তাঁতের শাড়ি, জমিনে অলিভ গ্রীন, আঁচলে ক্যাডমিয়াম রেড, কপালে রেড অকসাইডের টিপ। মূলত লাল রং যেহেতু প্রৌঢ়ের শিক্ষক জয়নুল পূর্বেই প্রৌঢ়ের চিত্তে স্থাপন করেছিল, তাই প্রৌঢ় লালের উষ্ণ সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে চায়নি কিংবা এড়িয়ে যেতে অক্ষম ছিল। এরপর সুযোগ পেলেই যুবতীর সাথে নৌকাভ্রমণ ও ঘনিষ্ঠ হওয়া। যেদিন যুবকের সাথে যুবতীর প্রথম পরিণয় ঘটে, তার কিছুক্ষণের মাঝেই যুবতী প্রৌঢ়কে সংবাদটি দিতে আসে। আর ঈর্ষাবশত যুবক পৌঁছে যায় প্রৌঢ়ের বাসস্থানে। যুবকও একজন শিল্পী। তার আরেকটি পরিচয়, সে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিল। যুবক বলে:

> আপনার অজানা নয় আমার বয়স আর আমি কোন কালের সন্তান।
> এ হাতে এখন তুলি, একদিন গ্রেনেড ছিল এই হাতে; (হক, ২০১৬, পৃ. ৩২)

সে অকপটে স্বীকার করে, প্রৌঢ়ের আঁকার কৌশলকে সে ঈর্ষা করে। যুদ্ধে যুবকের সহোদরেরা হয়েছে শহীদ, দুই ভাবী করেছে আত্মহত্যা, বোনটি লজ্জায় নিজেকে কচুরিপনার মাঝে লুকিয়ে রাখে। এ সমস্ত ভুলে সে আশ্রয় পেতে চেয়েছিল যুবতীর ভালবাসার গৃহে। অথচ একদিন সে আবিষ্কার করে যুবতী সযতনে লুকিয়ে রেখেছে প্রৌঢ়ের মুখের অসম্পূর্ণ অবয়ব। প্রৌঢ়ের গৃহে প্রবেশের শুরুতেই সে জানতে পারে প্রৌঢ় যুবতীর ন্যুড এঁকেছে। সবকিছু জেনে নিজের ভালবাসাকে হত্যা করে সে চলে যায়। যুবতীও চলে যায় একসময়, একা হয়ে যায় প্রৌঢ় নিজের স্টুডিওতে। সে সময় আসন্ন পরাজয় উপলব্ধি করে সে স্বীকার করে:

> শোক নয়, ক্রোধ নয়, নদী নয়, ছবি নয়,
> আমার রক্তের ভেতর দিয়ে পাড় ভেঙে বয়ে যাচ্ছে ঈর্ষা কেবল?
> গ্রে নয়, রেড নয়-ব্লু? সেই ব্লু, কোবাল্ট ব্লু, ঈর্ষা ব্লু। (হক, ২০১৬, পৃ. ৬৯)

কান্নায় ভেঙে পড়ে সে, তাঁর ঈর্ষা যুবতীর প্রেমকে ফিরে পাবার জন্য, বারবার মিনতি করতে থাকে সে নিভৃত গৃহে যুবতীকে ফিরে আসতে। উপলব্ধি করতে সে সক্ষম হয়, তার শিল্পীসত্তার সাথে মনুষ্যসত্তার সংঘাতের জন্যই এই একাকীত্ব। এক সময় তার শিল্পীসত্তা ও

মনুষ্যসত্তা একবিন্দুতে মিলে যায়, নিজে উপলব্ধি করে সে রঞ্জিত হচ্ছে ঈর্ষার নীল রঙে। সবশেষে প্রৌঢ় মেঝেতে স্থির হয়ে বসে পড়ে, তার কাঁধে স্থাপিত হয় নির্ভরতার হাত। সে এখন অনেক স্থির, অভিজ্ঞতার চিহ্ন তার পাক ধরা চুলে যুবতীর দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানে প্রৌঢ় হাত দুটো বাড়িয়ে দেয়– পুনর্বার নিজেকে সে নিঃশেষ হতে দেবার মহাগৌরব থেকে বঞ্চিত হতে দেয়নি।

(২) চরিত্রত্রয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ : যে-কোনো নাটকে প্লটের পরই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে চরিত্র : “Character is the principal source for plot.” (Brockett & Gross, 1974, p. 29)। চরিত্রের সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমেই নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটি কর্ম-সম্পাদন করে থাকে, এতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে দ্বন্দ্ব। মূলত যে-কোনো নাট্যঘটনা নাটকে বর্ণিত চরিত্রগুলো তখনই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, যখন এতে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি থাকবে। সামগ্রিক বিষয়টি একটি কাঠামোর মধ্যে সংঘটিত হয়, এটি হলো : “beginning, middle and end.” (Brockett & Gross, 1974, p. 26)। আর এক্ষেত্রে নাটকের উন্মোচন হয় কিছু প্রশ্ন কিংবা “potential conflict” (Brockett & Gross, 1974, p. 27)-এর মাধ্যমে। নাটক শুরু হয় উদ্দীপক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। উদাহরণস্বরূপ, *ঈর্ষা* নাটকটির শুরুতে দেখা যায়, প্রৌঢ় দৃঢ় কণ্ঠে যুবতীর কথার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। অর্থাৎ নাট্যঘটনা আরও আগে ঘটে গেছে। যে-কোনো নাটক ভূমিকা থেকে শুরু হতে পারে, আবার ঘটনার মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু হতে পারে, কিংবা শেষ থেকে শুরু হতে পারে। আলোচ্য *ঈর্ষা* নাটকটি প্রৌঢ়, যুবতী ও যুবকের মাঝে প্রেমের ঘটনা স্থাপন হয়ে যাবার কোনো এক পর্যায়ে যুবতী সিদ্ধান্ত নেয় যে-কোনো একজনকে বেছে নেবার বিষয়ে। এরপর সে যুবককে বিয়ে করে। অর্থাৎ নাট্যঘটনা মধ্যবর্তী স্থান থেকে এগিয়ে গেছে, এর পূর্বের ঘটনা চরিত্রত্রয়ের সংলাপে ও পরিণতি নাটকের শেষে পরিলক্ষিত হয়। যুবতী স্পষ্টরূপে বলে ওঠে:

> সেই মুহূর্তেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আপনি বা সে, একজন– কারণ সেই মুহূর্তে আপনি আমার কাছে ধরা দেন শিল্পী নয়, রক্তমাংসের ইচ্ছার তাপে তৈরী একজন মানুষ হয়ে। (হক, ২০১৬, পৃ. ৬৬)

অর্থাৎ তিনজনের মাঝে জটিলতা এড়াতে যুবতী বিয়ে নামক আরও জটিল একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যা আদতে অদূরদর্শী একটি সিদ্ধান্ত। স্পষ্টতই যুবতী চরিত্রটি প্রৌঢ় ও যুবক উভয়কে ভালবেসেছিল। সুতরাং গবেষণার এই পর্যায়ে প্রেম সম্পর্কে এভাবে বলা যায় : “From a social systems perspective love is observed as a- *symbolically generalized medium*, rather than as a feeling, which only concerns a- *psychic system*.” (Baraldi, Corsi & Esposito, 2021, p. 129)। প্রৌঢ় এবং যুবতী কিংবা যুবক ও যুবতীর মাঝে প্রেম নামক মানসিক ক্রিয়াটি তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন তারা তাদের মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। প্রেম নামক ক্রিয়া তাদের শুরু থেকেই কিছু কার্যকারণের সূত্রে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। এই সীমাবদ্ধতার ফলে ঈর্ষা নামক অনুভূতিটি যা প্রাথমিক পর্যায়ে যেখানে কেবলই মানসিক ছিল, তা গিয়ে পৌঁছায় পাশবিকতার পর্যায়ে। মানবিকতা থেকে পাশবিকতার পর্যায়ে পৌঁছায় বিধায় তারা নিজেরা

সংযত হতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের মাঝে ছিল বিবেচনাবোধ : "Conscience is an umbrella term that plays an important role in our moral life and serves as a bridge between beliefs and action." (Zucca, 2020, p. 136)। যুবক-যুবতীর প্রতি আসক্তি থেকে পশ্চাদপসারণ করে, নিজের জন্য ক্ষুদ্র প্রদেশ রচনার মাধ্যমে প্রস্থান করে। নিঃসন্দেহে যুবক মানব-সভ্যতার একজন, যে পাশবিক অনুভূতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি ঠিকই; তথাপি সে নিজের ভেতর একটা শিল্পীসত্তাকে জাগ্রত করতে পেরেছিল। একই সাথে সে প্রেমিক এবং শিল্পী এবং এই দুটো সত্তা থেকে জাগ্রত হয়েছিল ঈর্ষা। সে একদিকে মানবিক প্রেম ও শিল্পীসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে তার ব্যক্তিগত জীবনে অর্জিত সব রকম পারদর্শিতা ও মানবিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সমন্বয় করতে চেয়েছিল স্বীয় প্রেমকে। বিশেষত, জ্ঞান আহরণ করতে সে যাবতীয় তথ্যাদি জেনেও সম্পর্ক রেখেছে যুবতীর সাথে। কিন্তু সামাজিক তাড়না তার মাঝে বিরাজ করতে থাকে, কেননা সে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রেম এবং শিক্ষা গুরুর শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত সম্পদে একধরনের তাড়নাজাত অসন্তুষ্টি বিরাজ করছিল যুবতীর মাঝে। এতকিছুর পরও সে যুবতীর প্রেমকে নিজের সক্ষমতা ভেবে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় তাদের মাঝে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মূলত, প্রেম-সম্পর্কিত তার যে উপলব্ধি তা চেতনা থেকে উদ্ভূত হয়। আর চেতনার কর্তা হচ্ছে মন। মন অবশ্যই দেহ থেকে পৃথক একটি সত্তা আর দেহ কেবলই বস্তু : "যার সারধর্ম (সংজ্ঞায়নের বৈশিষ্ট্য) হল স্থান দখল করা।" (শেফার, ১৯৮৩, পৃ. ৪৯)। যুবতীর প্রতি যুবকের চিন্তা, অনুভূতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষণ, কামনা, আবেগ থাকা সত্ত্বেও সে প্রৌঢ়ের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে চেয়েছিল। সাধারণভাবে, প্রেম কেবলই প্রেম অর্জনের জন্য একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রেম নামক অধ্যায়টির স্থান কেবলই মনোজগতে। কিন্তু যুবকের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সে নিজের ওপর যে মাত্রায় তাড়না অনুভব করেছে তা আদৌ তার নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। ফলে শিক্ষার তাড়না ও প্রেমের মাঝে সে কিছু পরিমাণে হলেও সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি। সে জানত বলপ্রয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রৌঢ়কে অপসারণ করে যুবতীর সমস্ত আবেগের নিয়ন্ত্রণ করতে সে পারবে না। সে স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছিল, অপরিহার্যতার প্রশ্নে সে নিঃসন্দিগ্ধ নয়। কারণ তার প্রেম শৃঙ্খলাহীন এবং নির্ভরশীলতার প্রশ্নে ব্যর্থ। আর দ্রুত পদক্ষেপে নিজেকে কিংবা যুবতীকে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ না দিয়ে স্বীয় অস্তিত্বের স্বার্থে যুবতীর প্রত্যাখ্যান মেনে চলে যায়। রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) এর মতে : "যেহেতু মন এবং দেহ পৃথক সত্তা সে কারণেই এদের প্রত্যেকটিই অপরটিকে ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারে।" (শেফার, ১৯৮৬, পৃ. ৪৯)। এদিক থেকে দেকার্তের ভাষ্য যদি সত্য হয় তবে সে যুবতীর প্রতি সকল অনুভূতির জলাঞ্জলি দিতে সক্ষম। কিন্তু এই তথ্যটি প্রৌঢ়ের অনুভূতি প্রকাশের বিষয়ে সক্ষম নয়। প্রৌঢ়ের সাথে যুবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হয় প্রৌঢ়ের ভাস্কর্য বিভাগে যাওয়ার পথে। সাক্ষাতের প্রথম পর্যায়ে সে বয়সের বিধি নিষেধের মধ্যে নিজের অবস্থান খুঁজতে প্রলুব্ধ হয়েছিল। যুবতী প্রৌঢ়কে "স্যার" বলে সম্বোধন করলে, সম্বোধনটি মেনে নিতে প্রৌঢ়ের কষ্ট হয়। বিষয়টিকে সে সম্পর্কের নিষেধাজ্ঞা ভাবতে থাকে। এই সম্বোধন অবশ্যই দুটো সম্পর্কের মাঝে স্বাভাবিক, তবে এটি প্রৌঢ়কে প্রভাবিত করেছিল সামনের পথে এগিয়ে যেতে। নতুবা

যুবতীর প্রতি প্রৌঢ়ের আকর্ষণকে নিছক শরীর-সম্পর্কীয় বলে বোধ হতো। নিষেধাজ্ঞা থেকে প্রৌঢ়ের অসমপথে যাত্রা শুরু হয়। এর মাধ্যমে সে পাশবিক অবস্থা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ পায়। তার আকাঙ্ক্ষাকে যুবতীর প্রাথমিক ইচ্ছার সাথে স্থাপন করলে প্রাথমিকভাবে অদ্ভুত দেখায়। তাই সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে প্রৌঢ়কে বঞ্চিত থাকতে হতো, তথাপি মানসিকভাবে এক পর্যায়ে যুবতী প্রৌঢ়ের আকাঙ্ক্ষায় সায় দেয়। প্রৌঢ়ের চিত্তে তখন : "জয়নুল আবেদিন, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, লাল শাড়ি–"। (হক, ২০১৬, পৃ. ২৩)। প্রৌঢ়ের সাথে যুবতীর সকল মানসিক নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল উঠে যায় নদী দেখে ফিরে এসে। যুবতীর গোপন আকাঙ্ক্ষায় ছিল শিল্পাচার্য জয়নুল আর সম্মুখে তারই শিক্ষক। দুটো সত্তাকে সে এক করে নদীভ্রমণ করতে যায়। আর প্রৌঢ় লাল শাড়ি পরিহিত যুবতীকে দেখে জয়নুলের শেষ সংলাপের অস্তিত্বের সাথে নিজেকে লীন করে ফেলে। সে দেখতে পায়ঃ "সবুজ ধানের ক্ষেতে লাল শাড়ি পরা নারীটির নিজস্ব জয়নুল।" (হক, সৈয়দ শামসুল, ২০১৬, পৃ. ১৫)। তাদের দুজনেরই আদিম তাড়নাজাত আকাঙ্ক্ষার সাথে প্রেম নামক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান মিশে যায়। এক্ষেত্রে দুজনেই শিক্ষকের চাওয়ার সাথে নিজেকে লীন করে ফেলে। প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা কিংবা মানসিক পরিস্থিতি তাদের ছিল না। এক্ষেত্রে দেকার্তের দেহ ও মন আলাদা হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়। তাদের চেতনা সম্পন্ন মন দেহের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ দেকার্তের অনুসারী Spinoza (১৬৩২-১৬৭০) এর মতে : "তবুও আমরা তা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে, তারা দুটি সত্তা অথবা দুটি পৃথক দ্রব্য (substances)।" (শেফার, ১৯৮৬, পৃ. ৫০)। প্রাথমিকভাবে সম্পর্কটির মাঝে অনিষ্টকর কোন ঘটনার উদ্রেক হয় না। তবে যখন যুবতী প্রৌঢ় ও যুবক উভয়ের কাছে সম্পর্কের তথ্য প্রকাশ করে তখন উভয়ের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করে, বিপজ্জনক বিদ্রোহের জন্ম দেয়। যদি যুবতী একপক্ষকে দমিয়ে অন্য পক্ষকে সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত করে, তবে যুবতীর মানসলোকে বিরুদ্ধবাদিতার জন্ম হয়। স্পষ্টতই, প্রেম-বিষয়ক এরূপ সম্পর্কে উভয়পক্ষের মাঝে সৃষ্টি হবে ঈর্ষা; সেখানে তাদের নীতিজ্ঞান, সামাজিক মূল্যমান বিবেচনা করার ক্ষমতা থাকে না। আদর্শ ও শৈল্পিকতা সৃষ্টির বদলে প্রৌঢ় ও যুবকের মাঝে জন্ম নেয় অসন্তুষ্টি। উভয়ে তাদের আদর্শ ও মানসিক ঐশ্বর্যের তথ্য যুবতীর সামনে তুলে ধরে। স্বীয় আদর্শকে সামনে রেখে জীবনের সর্বোত্তম জিনিস অর্জন করতে প্রৌঢ় ও যুবক উভয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে : "Furthermor, several observation suggest that the attributions made will influence the degree and kind of jealousy." (BUUNK, 1984, p. 107)। স্পষ্টতই সৈয়দ হক সভ্যতার নিষেধাজ্ঞাগুলো চরিত্রগুলোর মাঝ থেকে প্রত্যাখ্যান করেননি। নতুবা তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বাধা হিসেবে দাঁড়াতে না দিয়ে "ইতস্তত বোধ না করে খুন করতে পারে" (ফ্রয়েড, ২০১৩, পৃ. ২৯)– এমন কর্তব্য সম্পাদন করতো। মূলত নাট্যকারের নৈতিকতার বিলোপ সাধনের প্রসঙ্গটি পাঠকের প্রতি তার অবিশ্বস্ততা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে, বিষয়টি সম্পর্কে সৈয়দ হক সচেতন ছিলেন। আর তাই তাঁর চরিত্রত্রয় নিজেদের প্রতি অন্যের রাজত্ব স্থাপন করার সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। ফলে, যুবক ও যুবতী প্রস্থান করে এবং প্রৌঢ় স্থবিরভাবে বসে থাকে। তিনটি চরিত্রকে বিশ্লেষণ করলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, তা হলো এরা কেউ পাঠকের সহানুভূতি (Sympathy) আদায়

করে না, কিংবা এমন দাবি করে না, যার মাধ্যমে পাঠক চরিত্রত্রয়ের সাথে সহমর্মিতা (Empathy) অনুভব করে। নাটকের তিনটি চরিত্রই মুখ্য, তবে আদর্শ নয়। কিন্তু এই ধরণের চরিত্রের মাধ্যমে পাঠকের বোধের দুয়ার উন্মোচন হয়। উল্লেখ্য, সম্পর্কের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেও চরিত্রগুলো হতাশায় জর্জরিত হয় না, যদিও তাদের মাঝে শুন্যতা পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যুবতী ও যুবক মধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং প্রৌঢ় উচ্চবিত্ত। অর্থাৎ নাটকের মুখ্য চরিত্র হবার জন্য তাদের বাড়তি যোগ্যতা অর্জন করতে হয়নি। নাটকটি যেহেতু শুরু হয়েছে দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থান থেকে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়– চরিত্রত্রয় মানসিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে ছিল না : "as the possibilities become more limited." (Brockett & Gross, 1974, p. 27)। যেহেতু তারা প্রেম সম্পর্কিত জটিলতার মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করছিল এবং তাদের মাঝে যোগাযোগের সম্ভাব্যতা ক্ষীণ হয়ে আসছিল, তাই এই ত্রিমুখী সম্পর্কে ঈর্ষা নামক অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাদের মাঝে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে "Interactionism" (শেফার, ১৯৮৬, পৃ. ৫১) এর কারণে। যুবতীর সাথে যুবকের সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার কারণ তাদের মন দেহকে প্রভাবিত করেছিল, তাই তারা একে অপরের সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে প্রৌঢ়ের সাথে যুবতীর সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তাদের দেহ মনকে প্রভাবিত করার কারণে। পরিণতিতে চরিত্রত্রয়ের মাঝে শঙ্কার সৃষ্টি হয়। আবার যুবতী ও প্রৌঢ়ের মাঝে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেখানে তাদের মাঝে স্থাপিত দৈহিক ঘটনা ''সর্বদাই মানসিক ক্রিয়ার ফলশ্রুতি মাত্র" (শেফার, ১৯৮৬, পৃ. ৫২); আর একে "reverse epiphenomenalism" (শেফার. জেরোম. এ, ১৯৮৬, পৃ. ৫২) বলা হয়ে থাকে। তাদের মাঝে স্থাপিত ঘটনা যা তারা পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আবার, যুবতী ও যুবকের সম্পর্কে দেহ ও মন এতটাই পৃথক ছিল যে, একটা অন্যটার ওপর ক্রিয়া করতে সক্ষম ছিল না। প্রৌঢ় ও যুবতীর ক্রিয়াক্রর্ম ক্ষুব্ধ হয়ে যুবক বলে ওঠে :

> আমিও ফিগার আঁকি, যদিও আমার স্ত্রীর এখনো আঁকিনি, আসলে
> এখনো আমি আপনার মতো করে সমস্ত খসিয়ে তার শরীর দেখিনি;
> কল্পনা করেছি কেবল, আর বড় প্রতীক্ষা করেছি। (হক, ২০১৬, পৃ. ৩৩)

দুটো সম্পর্কেই চরিত্রত্রয়ের মানসিক অবস্থা সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আর মন যেহেতু মস্তিষ্কের চেয়ে ভিন্ন অবস্থায় অবস্থান করে তাই তারা তাদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী নয়। আক্ষরিকভাবে দেখা যায় তাদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত বিপর্যস্ত হবে না, কিন্তু এটা কখনই পরিমাণে পরিমাপ করার উপায় নেই। এটা অবশ্যই তাদের মানসিক অবস্থাকে বুঝাচ্ছে, তাই তাদের কষ্টের পরিমাণ কেবল অনুভব করা যায়। তারা তাদের মানসিক কষ্টের সাথে শেষাবধি একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল, কোন চরিত্র পেরেছিল আবার কেউ পারেনি। কষ্টকে প্রৌঢ় রঙের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে, যে রঙ একই সাথে প্রেম এবং একইসাথে বিষাদকে বহন করে। শেষাবধি প্রৌঢ় উপলব্ধি করে : "... সেই ব্লু, কোবাল্ট ব্লু, ঈর্ষার ব্লু।" (হক, ২০১৬, পৃ. ৬৯)। মূলত এখানে প্রৌঢ়ের প্রেমিকসত্তা ও শিল্পীসত্তা লীন হয়েছিল। সে প্রকৃতই উপলব্ধি করেছিল তাঁর জীবনে যা কিছু ঘটেছিল তার বিপরীতে যুবতীর স্থান অনেক উর্ধ্বে। প্রৌঢ় নিজের জীবনের স্বার্থে

অত্যাবশ্যকীয় নিশ্চয়তাটুকু ত্যাগ করতে চায়নি। গবেষণার এই পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপন স্বাভাবিক যে, যুবতীর প্রেমে প্রৌঢ় কোথায় নিশ্চয়তা পেয়েছিল; যার ফলে প্রবল ঈর্ষান্বিত হয়েও তাকে ত্যাগ করতে চায়নি।

১.৫ গবেষণা ফলাফল : *ঈর্ষা* নাটকে চরিত্রত্রয়ের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, যুবতী চরিত্রটি যদি সভ্যতার আদেশ-নিষেধ পালন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চাইত– তবে সে তার মনস্তাত্ত্বিক জট খুলতে যুবকের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতো না কিংবা প্রৌঢ়ের কাছে তথ্য গোপন রাখত না। সে অসামাজিক তাড়নার অনুসরণ করে আপন ভুবনের ক্ষমতাচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিল। প্রৌঢ়ের কাছে শেষাবধি সে পেয়েছিল সান্ত্বনা আর এর সহায়তায় পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব বলে সে মনে করেছিল। প্রৌঢ়ের ভালবাসার বিনিময়ে শ্রেয়তর কিছু না দিয়ে প্রৌঢ়ের শেষ আশ্রয়টুকু ছিনিয়ে নিতে সে চায়নি। যুবক স্বেচ্ছায় যুবতীর প্রতি আকাঙ্ক্ষার প্রত্যাখ্যান জানিয়েছিল, যুবতী তাকে মেনে নেওয়ার আবেদন জানাতে চেয়েও পারেনি। যুবকের ভালবাসা পাবার জন্য যুবকের দয়ার কাছে যুবতী নতি স্বীকার করেনি। যুবকের কাছে ফিরে গিয়ে পুনরায় প্রৌঢ়ের দ্বারে ভালবাসার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়নি সে। এসবের প্রধান কারণ ছিল যুবতীর চিত্তে লালিত চার পুরুষের অবস্থান। শিল্পী কামরুল তাকে শিখিয়েছিল কেমন করে আঁকতে হয়, প্রৌঢ়ের চোখে সে দেখেছে জয়নুলকে আবার স্বীয় স্বপ্নের বাস্তবায়নের স্বার্থে সে খুঁজে নিয়েছিল প্রৌঢ়কে। তবে যুবকের সাথে সে যদি বোঝাপড়া করতে সক্ষম হতো, তাহলে জীবনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে পরিস্থিতি বদলাতে চাইত না। যুবতী যখন তার মনে দুজন মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করে ও তাদের স্বতন্ত্র করতে যায়, জটিলতা তখন দৃঢ় আকার ধারণ করে। কেন সে যুবকের পরিবর্তে প্রৌঢ়ের প্রতি আকৃষ্ট হলো, এর যুক্তিসঙ্গত উত্তর থাকলেও মানসিকভাবে এর উদ্‌ঘাটন অসম্ভব। তাই যুবতী প্রাথমিক পর্যায়ে দুজনকে একইভাবে ভালবাসে। তাদের প্রতি যুবতীর আবেগ এর আলাদা প্রয়োগ অসম্ভব ছিলো বলে যুবতী প্রৌঢ়ের কাছে আসে বিয়ের সংবাদ প্রেরণ করতে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করতে গেলে, পৃথিবীর অনেক প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে যেতে হয়। অনেক তাত্ত্বিক মনের ধারণাকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম ও ভৌত ধারণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। মননধর্মী শব্দাবলী ও চিন্তা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, অনির্দিষ্টভাবে কথা বললে এতে যুক্তির ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়। প্রৌঢ়ের প্রতি যুবতীর আবেগের কারণ যদি হয়, সে শিক্ষকের মাধ্যমে স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল– তাহলে যুবকের তুলনায় প্রৌঢ়ের সামাজিক প্রতিপত্তির তথ্য গৌণ হয়ে যাবে, কেবল প্রৌঢ়ের গুণের কথা বলা হবে। কিন্তু প্রৌঢ়ও মানুষ, তারও দেহ ও মন আছে। এখন যদি বলা হয়, প্রৌঢ় যুবতীর চেতনায় তার প্রতি অনুভূতি জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তাহলে এর সমার্থক বাক্য হবে– যুবতী প্রৌঢ়ের অন্তরে প্রেমের বীজ বপন করেছে। তবে যুবতীর প্রতি প্রৌঢ়ের সমস্ত আবেগ যুবতীর দ্বারা উৎপাদিত হয়, একথা উচ্চারণ করলে বাক্যটি হয়ে যাবে বিতর্কমূলক। এর চেয়ে যুক্তিসঙ্গত কথা হচ্ছে যুবতীর প্রতি প্রৌঢ়ের সমস্ত আবেগ প্রৌঢ় একা উৎপাদন করেছে। প্রৌঢ় হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি, যার শৈল্পিক গুণ রয়েছে। অপরদিকে যুবতীর কাছে যুবক সেই ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল যে ঘটনাচক্রে দৈহিক ও মানসিক গুণাবলি অর্জন করেছিল।

আর এই পার্থক্যটি প্রাথমিক পর্যায়ে যুবতী নির্ধারণ করতে পারেনি বলে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। যুবক ও প্রৌঢ় উভয়ে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। যদিও যুবকের প্রথম ঈর্ষা প্রৌঢ়ের আঁকার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। সে ক্রমেই উপলব্ধি করতে পারে অসাধারণ আঁকার ক্ষমতার গুণেই যুবতী প্রৌঢ়ের প্রতি আসক্ত। অর্থাৎ প্রৌঢ়ের মানসিক ও দৈহিক উভয়গুণই ছিল। যুবতী যথার্থই উপলব্ধি করেছিল, প্রৌঢ়ের মাঝে আছে এমন ব্যক্তিত্বের উপাদান– যা আদতে দৈহিক গুণ থেকে পৃথক, আর তা হলো প্রেমিকসত্তা। আর এই কারণেই প্রৌঢ়ের প্রতি অনুভূতি যুবকের প্রতি অনুভূতির চেয়ে হয়েছিল পৃথক। যুবতী প্রৌঢ়ের কাছে পেয়েছিল দেহ ও প্রেমের যৌগিক মিশ্রণকে। অর্থাৎ, প্রৌঢ়ের ব্যক্তিগত কিছু গুণাবলির জন্য যুবতী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যেহেতু দেহের স্থিরাবস্থা বজায় থাকে না, সেহেতু প্রৌঢ়ের বয়স যুবতীর চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও নাটকের শেষাংশে যুবতীরও চুলে পাক ধরেছে দেখা যায়। অর্থাৎ সমাপ্তিতে প্রেমের শক্তির বিমূর্ত অবস্থা দেখানো হয়েছে, যেখানে তাদের প্রেম একটি সত্তায় পরিণত হয়েছিল; এমতাবস্থায় তাদের সনাক্তকরণের প্রয়োজন আর নেই। এর আগে যুবক সচেতনভাবে যুবতীকে পরিত্যাগ করেছিল। যুবক যখন প্রৌঢ়ের প্রতি যুবতীর আসক্তির তথ্য জানতে পারে, তখন সে স্বীয় অবস্থান সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। যুবকের চেতনার অবস্থা দেহকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, যদি এই সত্যের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়, তবে স্পষ্টতই ওথেলো কমপ্লেক্সের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। মূলত :

> The most defining features of jealousy are that it requires a social triangle and occurs when some one perceives that another person (who may be real or imaginary) poses a potential threat to an important interpersonal relationship. (Harris & Darby, 2010, p. 548)

ঈর্ষা এমন একটি বিষয়, যার মাধ্যমে এক পক্ষের প্রত্যাখ্যানের ফলে বিষয়টি অন্যপক্ষের বিপরীতে স্থাপিত হয়। বর্তমান *ঈর্ষা* কাব্যনাট্যটি মূলত রোমান্টিক সম্পর্কের বিপরীতে গড়ে উঠেছে। যেখানে প্রৌঢ় ঈর্ষা করে যুবতীর প্রতি যুবকের কিংবা যুবকের প্রতি যুবতীর আবেগকে; অন্যদিকে যুবক ঈর্ষা করে প্রৌঢ়ের শিল্পীসত্তা ও প্রেমিকসত্তাকে। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার ফলে নাটকে “anger, fear, and sadness” (Haris & Darby, 2010, p. 548) এর উদ্রেক হয়েছে। ঈর্ষার ফলে প্রতিটি সম্ভাবনাকে তারা বিনষ্ট করে দিচ্ছিল। এর ফলে সকল সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে যুবক প্রেক্ষাপট বদলে দেয়। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে যুবক ভেবেছিল যুবতীর মনে তার জন্য বিশেষ কোনো স্থান নেই। এ যেন প্রৌঢ়ের বিমূর্ত চিত্রের নতুন সংস্করণ। নাটকটির “discovery” (Brockett & Gross, 1974, p. 27) তখনই সংঘটিত হয়, যখন যুবতীর প্রত্যাবর্তন ঘটে। যুবতীর প্রস্থানের পর প্রৌঢ়ের চারপাশ নীল রঙে ছেয়ে যায়, কাঁদতে থাকে সে অবিরত, সেই কান্নার রং নীল– যে নীলে মিশে আছে প্রেম, ঈর্ষা ও ভালবাসা। অবিরত নীলের বর্ষণে নিজের অস্তিত্বকে সহনীয় করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় সে। যার মাধ্যমে যুবতীর প্রতি তার সমস্ত আবেগ পাঠকের সমর্থনপুষ্ট হয়। এভাবেই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে নিজেকে কঠোরভাবে বশে রাখে প্রৌঢ়। যুবতীর প্রাথমিক আবেগের কাছে প্রেমের উচ্চতর প্রতিকৃতি গঠন করতে সক্ষম হয়

সে। সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যুবতীর ইচ্ছাকে স্বীয় ইচ্ছায় স্থানচ্যুত করার প্রয়াস চালালে বিষয়টি সর্বোত্তমরূপে সঙ্গত হতো না। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সে শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারলেও নিজের পাপিষ্ঠ কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিজের ইচ্ছাকে নিজে শ্রদ্ধা করতে পারতো না। নৈতিক ভাবাদর্শের ভাণ্ডারে কেবল ইচ্ছাপূরণকে দীর্ঘস্থায়ী সফলতা বলা যায় না। নীল রং সত্যিকার অর্থে তুলনাহীন ক্ষমতার ভাণ্ডার দান করেছিল তাকে। আর এই মানসিক অবস্থা আলোর উৎসের সম্মুখস্থ চলনশীল আঙ্গুলের মতো নয়, বরং দেওয়ালের উপর পতিত ছায়ার মতো যা চলনশীল আঙ্গুল দ্বারা উৎপাদিত কিন্তু কোনোভাবে এটি প্রভাবিত করতে সক্ষম নয়। এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে, প্রৌঢ়ের চারপাশ নীলে রঞ্জিত করা হয় তার মনে ঈর্ষার উপস্থিতি প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে যুবতীর প্রস্থানের পর বিরামহীন মানসিক ঘটনা কেবল দৈহিক ছিলো না। যদি তখনও তার চেতনায় ঈর্ষার উপস্থিতি থাকত তবে স্রোতের টানে অকস্মাৎ ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করা যেত না। তারপরও তার মানসিক ক্রিয়া পৌঁছেছে বলে প্রমাণ হয় না। সব হারানোর পর প্রকৃতপক্ষে তার চেতনা দৈহিক নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। নতুনভাবে কাজ করতে শুরু করে তার দেহ-মন। প্রৌঢ় মৌলিকভাবে নতুন আবেগের অধিকারী হয়, পাশবিকতার বিপরীতে অর্জন করে আস্থা। জীবনে চলার পথে নির্বাচিত ঘটনার বিনিময়ে সে অর্জন করে আস্থা :

> আমি চিনি সেই নারী– আর সকলের মতো নির্দিষ্ট আয়ুর সীমায় সে বন্দী,
> শিল্পের বিষয় থেকে যে এখন পতিত, কিন্তু জীবনের ব্রহ্মপুত্রে নৌকার মতো স্থাপিত–
> আমার মানচিত্রে তাকেই আমি এখন চাই। (হক, ২০১৬, পৃ. ৭২)

শূন্যগৃহে প্রৌঢ়ের অপেক্ষা যুবতীর ফিরে আসার, কেননা : "love can only be motivated by love." (Baraldi, Corsi & Esposito, 2021, p. 130) নিজের তাড়নাজাত দাবি থেকে প্রৌঢ় নিয়ন্ত্রিত হতে পেরেছিল বিধায় তার আশ্রয়ে যুবতী নিজেকে প্রতিস্থাপন করে। আপাতদৃষ্টিতে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছিল বলে প্রৌঢ় আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়। যেখানে সে তাড়নাজাত আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত, সত্য একজন মানুষ, যার এমনটাই হওয়া উচিত।

১.৬ উপসংহার : মূলত, পৃথিবীর অধিকাংশ প্রেমের ঘটনা অমীমাংসিত এবং এর ব্যাখ্যা সংশয়মুক্ত নয়। কিছু মানুষ স্বীয় আবেগকে সংযত করে সরে যায়, আবার কেউ অপেক্ষা করে নীলে রঞ্জিত হয়ে। *ঈর্ষা* নাটকটিতে যুবক চরিত্রটি স্বীয় চিন্তার সাথে সামাজিক সংস্কারগুলোর মিশ্রণ ঘটিয়েছিল, আলাদা স্থান দিতে পারেনি স্বীয় প্রেমকে। ফলে, যুবতীকে স্বীয় আওতায় আনার চেয়ে অবস্থান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। যুবতীর গোপন প্রণয় সম্পর্কে জানতে পারার প্রারম্ভিক ধাক্কায় আপাতদৃষ্টিতে নিজেকে সামাল দিলেও যুবতীর গুপ্তপ্রণয়ী থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিল সে। মোটের ওপর চরিত্রটি নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থার ভেতর দিয়ে দিনাতিপাত করছিল। পক্ষান্তরে, প্রৌঢ় সকল কিছু সম্পর্কে অবগত হয়েও আশার আলো নিয়ে অপেক্ষা করেছিল এবং কঠিন পরিস্থিতির মাঝে আবিষ্কার করে সে একা নয়। মহাবিশ্বের তুলনায় নগণ্য নয় তার প্রেম, তার স্নেহশীল তত্ত্বাবধানকে আরও বেগবান

করতে তার কাঁধে স্থাপিত হয় যুবতীর হাত। নির্মম বাস্তবতা মোকাবিলায় যুবক সেখানে নতিস্বীকার করে, প্রৌঢ় সেই স্থানেই হয়ে পড়ে স্থবির। প্রেমের প্রতীকী ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে সত্য মানুষে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল প্রৌঢ়, যার ছায়া সৈয়দ শামসুল হক এঁকেছেন যুবতীর পাক ধরা চুলের অবয়বে; প্রৌঢ় অর্জন করে যুবতীর বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র

ফ্রয়েড, স. (২০১৩)। *একটি দৃষ্টিভ্রমের ভবিষ্যত* (আলীফ হোসেন, অনু.)। সংহতি, ঢাকা।

শেফার, জেরোম এ. (জুন, ১৯৮৩)। *মনোদর্শন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হক, সৈয়দ শামসুল। (২০১৬)। *ঈর্ষা*। চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

Buunk, B. (1984). “JEALOUSY AS RELATED TO ATTRIBUTIONS FOR THE PARTNER’S BEHAVIOR”. *Social Psychology Quarterly*. 1 (47), 107, doi.org/ 10.2307/3033894.

Baraldi, C., Corsi, G. & Esposito, E. (2021). *Unlocking Luhman*. (129) Bielefeld University press. www.jstor.org/stable/j.ctv2f9xsr5.33.

Brockett & Gross, O. (1974). *The Theatre an introduction*. (3rd ed., 29) Holt, Rinehart and Winston.

Harris, C. R. & Darby, R. S. “Jealousy in Adulthood”. Retrieved October 17, 2022.

Kesgin, C. E. & Hashemipour, S. (2020). “Othello in Shakespearean Tragedy of Othello”. *Discrimintion is Evil: Eassays on Literary Masterpieces*. Nobel Academic Publishing.

Zucca, L. (2020). “Corscience, truth & Action”. *Daedalus,* 3(149), 136.www.jstor.org/ stable /10.2307/48590945.